অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। কেন বলো কাঁদালে আমায়।।

তাঁকে নিয়ে উৎকন্ঠা সবারই। কয়েকবার অসুস্থ হলেন। হাসপাতালে যাচ্ছেন। আবার ফিরে আসছেন। বয়েসের ভারে একটু কাতর। সবাই তা জানে তবু সবাই বলছে – না না যেও না রজনী এখনো বাকী..। পাঁচ প্রজন্মের গানের পাখি। ভারত উপমহাদেশের কিংবদন্তী সুর সম্রাজ্ঞী গানের পাখি লতা মুঙ্গেশকর – তবুও চলে গেলেন। বলে গেলেন – বুঝবে না কেউ বুঝবে না কি যে মনের ব্যথা।

চোখের সামনে তাঁর যাওয়াটা যেন কল্পনায় ভেসে আসছে। তিনি সজল চোক্ষে যেন গাইছেন – চলে যেতে যেতে দিন বলে যায় – আঁধারের শেষে ভোর হবে – হয়তো পাখির গানে গানে – তবু কেন মন উদাস হলো – হয়তো বা সব আলো মুছে যাবে–হয়তো বা থাকবে না সাথে কেউ……।

বিরানব্বইটা বছর একাই জীবনটা পার করে দিলেন। ১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের ইন্ডোরে শাস্ত্রীয় সংগীত ব্যক্তিত্ব ও থিয়েটার শিল্পী পণ্ডিত দীননাথ মুঙ্গেশকর ও শেবান্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন লতা। প্রথমে নাম ছিলো হেমা। পরে বাবার এক প্রিয় শিল্পীর নাম লতিকা থেকে তাঁর নাম হলো লতা। তার বাবা পণ্ডিত দীনানাথ মুঙ্গেশকর মরাঠি ও কোঙ্কিণী সংগীত শিল্পী ছিলেন, পাশাপাশি অভিনয়ও করতেন।

মাত্র ১৩ বছর বয়সে অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন লতা মুঙ্গেশকর। বাবাকে হারানো লতা,

পাঁচ ভাই-বোনের কথা ভেবে ওই বয়সেই হাল ধরেন সংসারের। ১৯৪২ সালে একটি মারাঠি ছবির জন্য প্রথম গান রেকর্ড করেন তিনি। সেই তাঁর যাত্রা শুরু। থামার সুযোগ পাননি আর । থামতে পারেননি। মা আর বাকী চার ভাইবোনের কথা ভেবে গান গেয়ে রোজগারের পথে ছুটেছেন। তাঁর যে বয়েস হচ্ছে একজনকে সাথী করে নিতে হবে সেদিকে তাকাবার সময় নেই। এভাবেই পার করে দিলেন ৯২ বছর একাকী।

সাত দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ৩০ হাজারেরও বেশী গান রেকর্ড করেছেন তিনি। ২০০১ সালে ভারতের সর্বোচ্চ নাগরকি সম্মান ‘ভারত রত্ন’-এ ভূষিত করা হয় তাঁকে। এর আগে ‘পদ্মভূষণ’, ‘পদ্মবিভূষণ’-এর মতো নাগরিক সম্মানও দেয়া হয়েছে লতা মুঙ্গেশকারকে। চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ পুরস্কার দাদা সাহেব ফালকে দ্বারাও সম্মানিত হয়েছেন তিনি।

তিনি ছিলেন ভারতের লতা – তেমনি পুরো উপমহাদেশের লতা। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে তাঁর কন্ঠের চুম্বকে সবাইকে টেনে রাখতেন – বেঁধে রাখতেন। একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে হলো।

১৯৯৬ তে AusAid Consultant হিসেবে প্রথমবার চীনে গিয়েছিলাম একটা প্রকল্প মূল্যায়ণের কাজে। গুয়াম প্রদেশে ওটা Farming Systems -এর বিশাল অংকের প্রজেক্ট অস্ট্রেলিয়ার অনুদানে। তো সেটা মূল্যায়ণ করতে আমাকে ওখানে ছয় সপ্তাহ কাটাতে হয়েছে। পুরোটা সময়ই আমাকে বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ছাড়াও গ্রামবাসি কৃষকদের সাথে দোভাষীর মাধ্যমে কথাবর্তা বলতে হতো। তো একদিন এক গ্রামে গেছি। নির্ধারিত এলাকায় লোকে লোকারণ্য। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম লোকজন সব রাস্তার অপর প্রান্তের প্রতি উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে আর কি সব বলাবলি করছে। দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলাম কি হচ্ছে ওরা মনে হয় কাওকে খুঁজছে। দোভাষী একটু ইতস্তত করে বলছে ওটা তুমি শুনতে চেয়ো না। বললাম বলই না অসুবিধা নেই। পরে দোভাষী যা বললো তাতে আর হাসি থামাতে পারিনি। ওরা জানে অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন আসছে যিনি ওদের সাথে কথা বলবেন। ওদের কাছে এই কালা অস্ট্রেলিয়ান গ্রহণযোগ্য হয়নি তাই সাদা অস্ট্রেলিয়ানের জন্য পথ পানে চেয়ে আছে।

অনেক কষ্টে দোভাষী ওদেরকে বোঝাতে সমর্থ হলো যে আমিই সেই তিনি। কথাবার্তার শেষের দিকে এক বৃদ্ধা তাঁর ভাষায় আমাকে কিছু বলছেন আমি শুধু এটুকু বুঝতে পারছি তিনি কথার মধ্যে বলছেন – লাতা লাতা লাতা পিয়াল কিতা দারনা। আমি দোভাষীকে শুধালাম - সে বললো মহিলা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি লতার গান পেয়ার কিয়া তো ডারনা কেয়া গানটা জানো কিনা? আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। চীনে এক অজ পাড়া গাঁয়ে এক বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি এ গান জানি কিনা? আমি শুধালাম এই মহিলা এ গান শুনলো কোত্থেকে? বললো এ এলাকায় এরা বহুকাল ধরে ভিসিআরে হিন্দি সিনেমা দেখে। এরা হিন্দি সিনেমার খুব ভক্ত। মহিলা তোমাকে ভারতীয় ভেবেছে এবং তার ধারণা ভারতীয়রা সবাই গান গাইতে পারে। আমি মহিলাকে হতাশ করতে চাইনি। গানটির চার লাইন গেয়ে শোনালাম। আবেগে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আর বলছেন লাতা লাতা লাতা।

ফেরার পথে প্লেনে বসে কেবল ভেবেছি গান দিয়ে কন্ঠস্বর দিয়ে কেমন করে মানুষের মন জয় করা যায় সেখানে ভাষা কোন প্রতিবন্ধক নয়। বৃদ্ধ মহিলা হয়তো গানটির অর্থ জানেন না জানার প্রয়োজনও বোধ করেননি শুধু শিল্পীর নাম আর তাঁর সুরেলা কন্ঠের যাদুটাই আঁকড়ে ধরে আছেন। কোথায় পোঁছে গেছেন লতাজী।

বিশাল মনের মানুষ এক। দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করতে করতে বড় হয়েছেন তাই মানুষের দুঃখ কষ্ট অনুভব করতেন। সবখানেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় তহবিল গঠনের জন্য ভারতীয় শিল্পী অভিনেতা অভিনেত্রীদের অবদান চিরস্মরণীয়। সে সময়ে উদ্দোক্তাদের কয়েকজন লতা মুঙ্গেশকারের বাড়ীতে গিয়ে শরনার্থীদের দূর্দশা এবং যুদ্ধের আর্থিক সংকটের কথা বলে সাহায্য চাইলেন। লতা মুঙ্গেশকার তাঁর চেক বই এনে তাতে এক লক্ষ রুপী লিখে দিলেন। তারপর তাঁর অতি বিখ্যাত কয়েকটি গানের রয়ালিটি দান করলেন সেই তহবিলে। বললেন যতদিন মুক্তিযুদ্ধ চলবে ততদিন এ রয়ালিটির টাকা এ তহবিলে জমা হবে। তাতেও তাঁর মন ভরে না। অজন্তা শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্লেনে চড়ে বিভিন্ন স্থানে গান পরিবেশন করে

শরণার্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন এই কিংবদন্তী গানের দেবী। পাশাপাশি গড়ে তুলেছিলেন বাংলাদেশের জন্য বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা।

এতো সন্মানীয় ব্যক্তিত্ব অথচ ছোট বড় সবাইকে সন্মান দিয়ে কথা বলতেন। একটা ঘটনার কথা বলি। তাঁর মৃত্যুর ঠিক পঁচিশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৯৭-র ৬ ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতী সিদ্ধান্ত নিলো তাঁরা বিশিষ্ট কয়েকজন গুণীজনকে তাঁদের সর্বোচ্চ সন্মান 'দেশীকোত্তম' প্রদান করবেন। তাঁদের মধ্যে লতা মুঙ্গেশকার, কণিকা বন্দেপাধ্যায়ও ছিলেন। যখন লতা মুঙ্গেশকারের নাম ঘোষণা করা হলো তিনি সহাস্য বদনে মঞ্চে এসে প্রথমেই মঞ্চে উপবিষ্ট কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। এক পর্যায়ে বললেন – দিদি আমি যদি আপনার মত করে রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারতাম।

স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু আরো কয়েকজন শিল্পী কলা-কুশলীর সাথে লতা মুঙ্গেশকারকে ঢাকায় আমন্ত্রন করে নিয়ে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁর সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালে লতাজী বলেন – বাংলাদেশকেও আমি আমার দেশ মনে করি। এদেশের মানুষ আমাকে ভালবাসে আমার গানকে ভালবাসে। আমি বাংলাদেশের জন্য ছিলাম আছি থাকবো।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে লতাজী বাংলাদেশী একটি ছায়াছবির জন্য গানও গেয়েছিলেন। মোমতাজ আলীর পরিচালনায় 'রক্তাক্ত বাংলা' এ ছায়াছবিতে সলিল চৌধুরীর সুরে গানটি ছিলো – "ও দাদাভাই মূর্তি বানাও হাত বানাও পা-ও বানাও"।

লতাজী আপনি পাঁচ প্রজন্মের গানের পাখি। এ উপমহাদেশ ছাড়িয়ে চীনের সেই প্রত্যন্ত গ্রামেও থাকবেন। আরো কত প্রজন্মের মাঝে থাকবেন জানিনা। আপনি তো যান নি। আপনি আছেন। যেমন করে বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন তেমনি করে আপনি আমাদের কাছে ছিলেন আছেন থাকবেন। যেখানেই থাকুন ভাল থাকুন। যাবার বেলায় বলবেন না যেন – কেন বল কাঁদালে আমায়!